জাতীয় শিক্ষাক্রম
২০১২

লঘু সঙ্গীত

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১. সূচনা

১.১ যেকোন কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে এর সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। শিক্ষা কার্যক্রমের এরূপ পরিকল্পনাই শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও শিখন চাহিদাকে সমন্বয় করে এবং সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয় নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম। কী, কেন, কিভাবে, কে, কার সহযোগিতায়, কী দিয়ে, কোথায়, কত সময় ধরে শিক্ষার্থী শিখবে এবং যা শিখেছে তা কিভাবে যাচাই করা হবে এসব প্রশ্নের উত্তর শিক্ষাক্রমে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন নির্দেশনা-এসবই শিক্ষাক্রমের প্রতিপাদ্য বিষয়। শিক্ষাক্রমের নির্দেশনার আলোক প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী। এ শিক্ষাক্রমকে আবর্তন করেই যেকোনো স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড পরিকল্পিত ও পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়। আর এ কারণেই শিক্ষাক্রমকে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীল-নকশা বলা হয়ে থাকে।

১.২ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, উন্নয়ন ও নবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে চলমান শিক্ষাক্রমের সবলতা-দুর্বলতা ও উপযোগিতা নির্ণয় করা হয়। সময়ের সাথে যেমন সমাজের পরিবর্তন ঘটছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এসবের ফলে শিখন চাহিদাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখা আবশ্যক। আবার যখন পুরোনো শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সময়ের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না, তখন নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হয়।

২. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যৌক্তিকতা

২.১ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ১৯৯৫ সালে পরিমার্জন, নবায়ন ও উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এরপর দীর্ঘ সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের শিখন-চাহিদাও পরিবর্তিত হয়েছে। এ চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২.২ প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপর **'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ'** সমীক্ষার ফলাফলে শিক্ষাক্রমের অনেক দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম অতিমাত্রায় তত্ত্ব ও তথ্য সংবলিত যা শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করতে উৎসাহিত করে। প্রচলিত শিক্ষাক্রমে অনুসন্ধান, সমস্যা সমাধান দক্ষতা অর্জন, হাতে-কলমে কাজ করে শেখার এবং সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বিকাশের সুযোগ সীমিত। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের সুযোগও কম। প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বিষয়বস্তু যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জলবায়ুর পরিবর্তন ও করণীয়, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদির প্রতিফলন খুবই সীমিত। তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া, লেখা এসব দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায় নি। শিক্ষার্থীদেরকে কর্মমুখী করার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের অবদান সন্তোষজনক নয়। নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

২.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে শিক্ষার মাধ্যমে যুগোপযোগী জনশক্তি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে এ শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

২.৪ বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ (VISION 2021) এর লক্ষ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত জনশক্তি সৃষ্টি করা। আর শিক্ষার মাধ্যমে তা করার জন্য প্রয়োজন উপযোগী শিক্ষাক্রম।

২.৫ একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট 'Learning: The Treasure Within' এ মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনের প্রবেশদ্বার ('gateway to life') হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অর্থ কর্মজীবনে প্রবেশের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতিবেদনে শিখনের চারটি স্তম্ভ (Pillar) চিহ্নিত করা হয়েছে। শিখনের এ স্তম্ভসমূহ হচ্ছে-জানতে শেখা (Learning to know), করতে শেখা (Learning to do) মিলেমিশে থাকতে শেখা (Learning to live together) এবং বিকশিত হতে শেখা (Learning to be) । এসব স্তম্ভ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন ও উন্নয়ন।

৩. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত মডেল

উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল (Objective Model) অনুসারে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন করা হয়েছে। এটিকে ফলভিত্তিক মডেলও (Product Model) বলা যায়। এ মডেল অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী বিষয় ও বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক প্রান্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। প্রান্তিক শিখনফলকে শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ- এ তিন ভাগে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে ভিত্তি করে শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন কৌশলসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়।

৪. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসইএসডিপি এর শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ, এনসিটিবি-এর শিক্ষাক্রম শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রবাহ চিত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

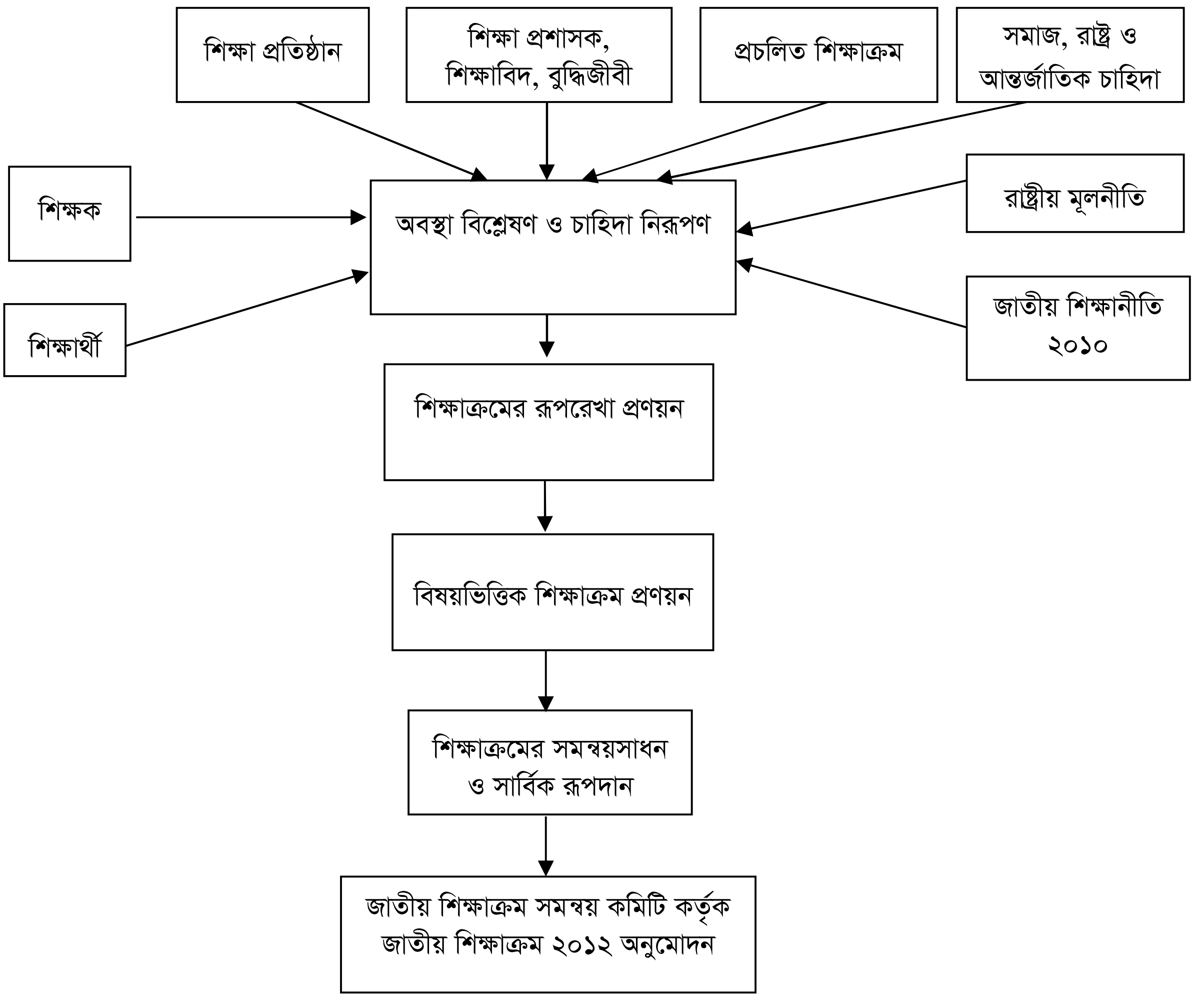

৪.১ অবস্থা বিশ্লেষণ

৪.১.১ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি) শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করেন। যৌক্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক এবং শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা যাচাই করা হয়। এই পর্যালোচনার ফলাফল নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিবেচনায় রাখা হয়।

৪.১.২ প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন

এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ **'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১০'** শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এ সমীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক, বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত এবং শিক্ষার্থীদের শিখন-চাহিদা নিরূপণ করা হয়।

৪.১.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাসমূহ পর্যালোচনা করে নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত তৈরি করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতেই প্রচলিত সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি) শিক্ষাকে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ও একমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একই শিক্ষাক্রম অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৪.১.৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের- ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া (অঙ্গরাজ্য), যুক্তরাজ্য (অঙ্গরাজ্য) এবং কানাডার (অঙ্গরাজ্য) সমসাময়িক শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়। এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ করে শিক্ষাক্রমের বিশেষ দিকসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এদের উপযোগিতা যাচাই করা হয়।

৪.১.৫ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা

দেশে-বিদেশে প্রকাশিত শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে-একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন UNESCO (1996) 'Learning: The Treasure Within; O'Neill, Geraldine (2010) 'Programme Design: Overview of Curriculum Models'; Marsh, C.J (1997) 'Perspective Key Concepts for Understanding Curriculum'; Sheehan, John (1986) Curriculum Models: Product versus Process, Smith, P.L (1993) Instructional Design, Macmillan; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম (২০১২), শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা শীর্ষক প্রতিবেদন (২০১২), জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, তামাক নিয়ন্ত্রণ, UNICEF (২০০৯) পরিচালিত 'জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা'।

তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য **৩১টি** প্রতিবেদন জমা দেয়। এসব প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। **৩১টি** প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, খাদ্য-পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি-এইডস, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ইত্যাদি।

৪.২ শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন

অবস্থার বিশ্লেষণ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের ভিত্তিতে এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ জাতীয় পরামর্শকের নির্দেশনায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের শিক্ষায় অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র নির্ধারণ করেন। এসবের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

৪.২.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা

- মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশপ্রেম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি
- নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান
- অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি
- বিজ্ঞানমনস্ক ও কর্মমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
- জীবনদক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- সব ধরনের বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান
- বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান

৪.২.২ **শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র**

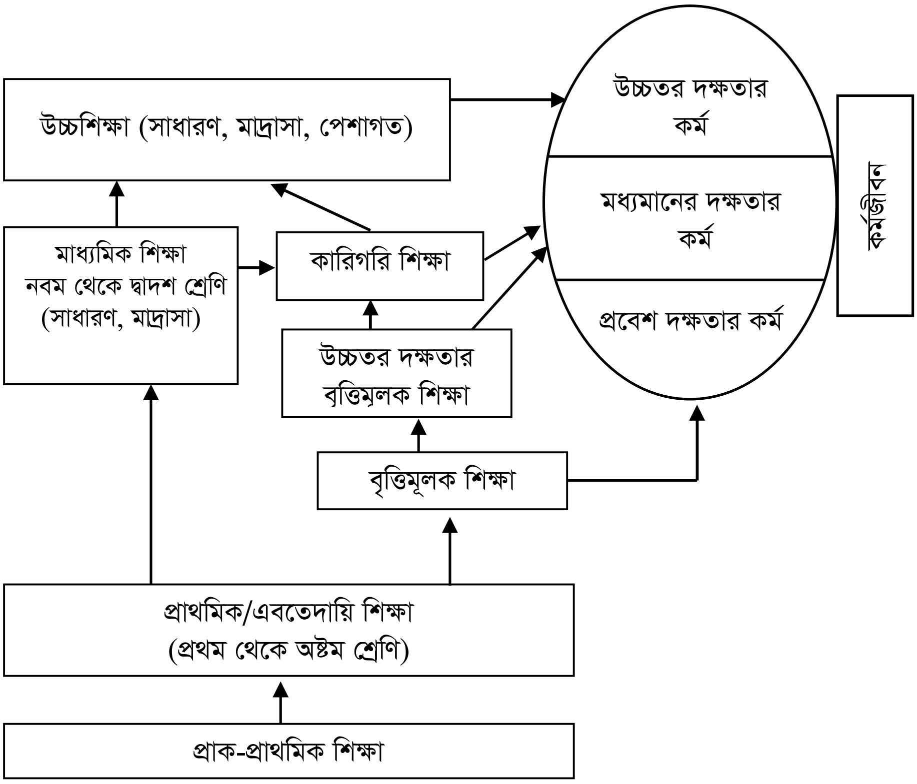

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে অঙ্কিত অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্রানুসারে ৮বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ চার বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং অন্য অংশটি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশ করবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে তারা উচ্চ শিক্ষায় যাবে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রথম দু'বছর শেষে কেউ কেউ কারিগরি শিক্ষায় যাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের একটি অংশ প্রবেশ দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, অন্যরা উচ্চতর দক্ষতার বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই শিক্ষা শেষে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় যাবে এবং অন্যরা মধ্যমানের দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। কারিগরি শিক্ষা শেষে কেউ কেউ উচ্চশিক্ষায় (পেশাগত) যাবে, কেউবা মধ্যমানের দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। উচ্চশিক্ষা শেষে উচ্চতর দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। এভাবে বিভিন্ন জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে তারা কর্মজীবন শুরু করবে।

৪.২.৩ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত নীতিমালা ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের শিক্ষায় অগ্রসরণ চিত্রকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমের খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া রূপরেখাটি শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ সভায় পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা হয়। এভাবে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি জাতীয় পর্যায়ের ২টি সেমিনারে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। এসব সেমিনারে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ সেমিনারে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করেন। সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি পরিমার্জন করা হয়। পরিমার্জিত রূপরেখাটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৪.২.৪ শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য, স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়, বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন ও সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা, শিক্ষাবর্ষের কর্মদিবস, পিরিয়ডের ব্যাপ্তি, জাতীয় দিবসসমূহে করণীয় ইত্যাদি।

৪.৩ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষক ও এনসিটিবিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫ থেকে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠন করা হয়। প্রতিটি বিষয় কমিটিতে সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এসইএসডিপির একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ।

৪.৩.১ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটিসমূহকে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে (ক) শিক্ষাক্রমের রূপরেখা পরিচিতি ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা (খ) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত ছক ও এর ব্যবহার (গ) ছকভিত্তিক হাতে কলমে নমুনা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং পর্যালোচনা।

৪.৩.২ প্রশিক্ষণে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিম্নলিখিত সোপান অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:

(ক) ভূমিকা (বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়) (খ) উদ্দেশ্য (সাধারণ উদ্দেশ্যাবলির আলোকে বিষয়ের উদ্দেশ্যাবলি) (গ) প্রান্তিক শিখনফল (বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলি অর্জন উপযোগী নির্ধারিত স্তর শেষে অর্জনযোগ্য শিখনফল।) ছক **১** এ প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন এবং ছক ২ এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল, অধ্যায় ও পিরিয়ড সংখ্যা, অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো নির্দেশনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা। যেহেতু নবম -দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি অবিচ্ছেদ্য শ্রেণি, সেহেতু এ দু'টি পর্যায়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ছক-**১** এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল বিভাজনের প্রয়োজন হয় নি।

৪.৩.৩ প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক কমিটি দিনব্যাপী নির্ধারিত সংখ্যক সভায় মিলিত হয়ে নির্ধারিত ছকে শিক্ষাক্রমের খসড়া প্রণয়ন করেন। এরপর একই ধরনের বিষয়গুচ্ছের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ ও শিক্ষাক্রম পরামর্শকের যৌথ সভায় খসড়া শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। বিষয় কমিটি সে অনুসারে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করেন।

৪.৩.৪ একই ধরনের বিষয়সমূহ নিয়ে চারটি দল গঠন করে প্রতিটি দলের আবাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ভেটিং কমিটি ও সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করেন।

৪.৩.৫ পরবর্তীতে সকল শিক্ষাক্রমের জন্য একটি সাধারণ অংশ (Generic Part) তৈরি করা হয়। এ অংশটি পূর্বে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের রূপরেখা ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়।

৪.৩.৬ এরপর প্রণীত শিক্ষাক্রম বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিষয়-শিক্ষকগণ দলগতভাবে স্ব স্ব বিষয়ের শিক্ষাক্রম নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন। কর্মশালার এ সুপারিশের আলোকে বিষয় কমিটি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সার্বিক রূপদান করেন।

৪.৩.৭ শিক্ষাক্রমটি টেকনিক্যাল ও ভেটিং কমিটি কর্তৃক পরিমার্জনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রফেশনাল কমিটি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর শিক্ষাক্রমটি **'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২'** হিসাবে গৃহীত হয়।

৪.৪ শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম

পর্যায়	কার্যক্রম	উন্নয়ন/প্রণয়নকারীবৃন্দ
১. অবস্থার বিশ্লেষণ	১.১ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ১.২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১০ পরিচালনা ১.৩ উন্নয়নশীল ও উন্নত কয়েকটি দেশের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ১.৪ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা	১.১ এসইএসডিপি ও এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ১.২ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ১.৩ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ১.৪ এসইএসডিপি ও এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
২. শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন	২.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা নির্ধারণ ২.২ শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র প্রণয়ন ২.৩ শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন	২.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপি এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২.২ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপি এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২.৩.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২.৩.২ জাতীয় সেমিনার দুটিতে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ
৩. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	৩.১. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান ৩.২. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	৩.১. শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও টেকনিক্যাল কমিটি ৩.২.১ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষক, এনসিটিবি ও এসইএসডিপির বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি ৩.২.২ বিভাগীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ৩.২.৩ টেকনিক্যাল কমিটি ও ভেটিং কমিটি
৪. শিক্ষাক্রমের সমন্বয় সাধন ও অনুমোদন	৪.১. শিক্ষাক্রমের সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য অংশ তৈরি ও সকল অংশের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ রূপদান ৪.২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ চূড়ান্ত অনুমোদন	৪.১.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ৪.১.২ টেকনিক্যাল কমিটি ও ভেটিং কমিটি ৪.১.৩ প্রফেশনাল কমিটি ও এনসিটিবি ৪.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি

৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বৈশিষ্ট্য

৫.১ সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষাধারাসহ সকল ধারার শিক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।

৫.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা সংযোজনের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় সংযোজন।

৫.৩ জলবায়ু পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য, তথ্য অধিকার, অটিজম ইত্যাদি বিষয়বস্তু সংযোজন।

৫.৪ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয় সংযোজন।

৫.৫ যুগের চাহিদানুসারে সকল স্তরের প্রচলিত বিষয়াদির বিষয়বস্তু আধুনিকায়ন এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি নতুন বিষয় সংযোজন।

৫.৬ ধর্ম শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.৭ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান। দেশাত্মবোধ বিকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস।

৫.৮ বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ।

৫.৯ মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষায় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এ চারটি দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রবর্তন।

৫.১০ শিখন-শেখানো কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল করা অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক, চিন্তা উদ্দীপক ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ প্রদান।

৫.১১ যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস। অর্থাৎ প্রতিটি তত্ত্ব, সূত্র ও নীতি শিক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক পাঠ গ্রহণের সুযোগ প্রদান।

৫.১২ হাতে কলমে শেখা ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে শেখার উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৩ শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

৫.১৪ শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৫ অধ্যায় থেকে কী কী জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় শিখনফল হিসাবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংযোজন।

৫.১৬ শিক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের সুযোগ সৃষ্টি। লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৭ বৈশ্বিক চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস।

৫.১৮ প্রতি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, অধ্যায়ভিত্তিক পিরিয়ড নির্ধারণ, শিক্ষাবর্ষে কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি।

৫.১৯ জাতীয় দিবসসমূহে স্কুল খোলা রেখে দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৫.২০ ধারাবাহিক মূল্যায়নের (গঠনকালীন মূল্যায়ন) মাধ্যমে শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সেবার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিতকরণ।

৫.২১ প্রচলিত ব্যবহারিক পরীক্ষার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের সুযোগ বন্ধ করা।

৫.২২ সামষ্টিক মূল্যায়ন/সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার।

৬. শিক্ষাক্রম রূপরেখা

৬.১ ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.২.১ শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৬.২.২ শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।

৬.২.৩ মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

৬.২.৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকচর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

৬.২.৫ শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

৬.২.৬ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

৬.২.৭ বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

৬.২.৮ আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

৬.২.৯ শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

৬.২.১০ শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

৬.২.১১ শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬.২.১২ দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬.২.১৩ খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবনদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

৬.২.১৪ শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।

৬.২.১৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি জাতীর এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীসমূহের, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

৬.২.১৬ শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

৬.২.১৭ জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

৬.২.১৮ সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

৬.২ বিষয় কাঠামো

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন

	সকল ধারার আবশ্যিক বিষয় (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারা)	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
১.	বাংলা	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
২.	ইংরেজি	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
৩.	গণিত	১০০	৪	৭০	১৪০
৪.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৫৩	১০৬
৫.	বিজ্ঞান	১০০	৪	৭০	১৪০
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**৬৫০**	**২৩**	**৪০২**	**৮০৪**
৭.	**সাধারণ শিক্ষা ধারার আবশ্যিক বিষয়**				
	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা /বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০	৩	৫৩	১০৬
৮.	শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫০	২	৩৫	৭০
৯.	কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা	৫০	২	৩৫	৭০
১০.	চারু ও কারুকলা	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**২৫০**	**৯**	**১৫৮**	**৩১৬**
	সাধারণ ধারার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)				
১১.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/আরবি/সংস্কৃত/পালি	১০০	২	৩৫	৭০
	সর্বমোট	**১০০০**	**৩৪**	**৫৯৫**	**১১৯০**

দ্রষ্টব্য:

- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০মিনিট ও অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০মিনিট।
- শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন ৬পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪পিরিয়ড।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশ (Assembly) এর মেয়াদ ১৫মিনিট এবং ৩য় পিরিয়ড পর মধ্যাহ্ন বিরতির ব্যাপ্তি ৪৫মিনিট।
- দুই শিফটে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সব ক্ষেত্রে ৫মিনিট করে সময় কম হবে এবং মধ্যাহ্ন বিরতির ব্যাপ্তি ২৫মিনিট।

৬.৩ সাধারণ শিক্ষা ধারার নবম ও দশম শ্রেণির বিষয়-কাঠামো, নম্বর ও সময় বন্টন

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময়বন্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
আবশ্যিক	১. বাংলা	২০০	৫	৮০	১৬০
	২. ইংরেজি	২০০	৫	৮০	১৬০
	৩. গণিত	১০০	৪	৬৪	১২৮
	৪. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা / বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১০০	২	৩২	৬৪
	৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩২	৬৪
	৬. ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	১৬	৩২
	৭. শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১০০	২	৩২	৬৪
	মোট	**৮০০**	**২১**	**৩৩৬**	**৬৭২**
শাখাভিত্তিক বিষয়					
বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. পদার্থবিজ্ঞান	১০০	৩	৫৪	১০৮
	৯. রসায়ন	১০০	৩	৫৪	১০৮
	১০.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০	৩	৫৪	১০৮
	১১.বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৫৪	১০৮
বিজ্ঞান শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ভূগোল ও পরিবেশ/চারু ও কারুকলা/সংগীত/বেসিক ট্রেড/শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৫৪	১০৮
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৬০৬**	**১২১২**
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	৫৪	১০৮
	৯. হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	৫৪	১০৮
	১০.ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	৫৪	১০৮
	১১.বিজ্ঞান	১০০	৩	৫৪	১০৮
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২.ভূগোল ও পরিবেশ/ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/ কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/চারু ও কারুকলা/ সংগীত/বেসিক ট্রেড	১০০	৩	৫৪	১০৮
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৬০৬**	**১২১২**
মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	৫৪	১০৮
	৯. ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	৫৪	১০৮
	১০. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	৫৪	১০৮
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৫৪	১০৮
মানবিক শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেয়া যাবে)	১২.অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা/চারু ও কারুকলা/কৃষিশিক্ষা /গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/ আরবি/সংস্কৃত/পালি/ সংগীত/বেসিক ট্রেড /শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৫৪	১০৮
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৬০৬**	**১২১২**

দ্রষ্টব্য:

- বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে যেকোনো একটি শাখা নির্বাচন করে নির্বাচিত শাখার আবশ্যিক বিষয়সমূহ নিতে হবে।
- সপ্তাহে ৬দিন দৈনিক ৬পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে।
- পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ও অন্যান্য বিষয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অনুরূপ হবে।

* **শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শাখা ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে পারবে।**

৬.৪ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়কাঠামো (শুধু ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য)

২০১৩ - ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' এর নির্দেশনা অনুসারে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় কাঠামো নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থী নিম্নের যেকোনো একটি শাখায় ভর্তি হতে পারবে। শাখাসমূহ হচ্ছে -
   ক. মানবিক খ. বিজ্ঞান গ. ব্যবসায় শিক্ষা ঘ. ইসলাম শিক্ষা ঙ. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান এবং চ. সংগীত

২. সকল শাখার আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা (পুরাতন শিক্ষাক্রম) ২. ইংরেজি (পুরাতন শিক্ষাক্রম) ৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

৩. শাখাভিত্তিক বিষয়সমূহ নিম্নরূপ -

শাখা	শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়	শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)
বিজ্ঞান	৪. পদার্থবিজ্ঞান ৫. রসায়ন ৬. জীববিজ্ঞান অথবা উচ্চতর গণিত	৭. (ক) জীববিজ্ঞান, (খ) উচ্চতর গণিত, (গ) কৃষিশিক্ষা, (ঘ) ভূগোল, (ঙ) মনোবিজ্ঞান, (চ) পরিসংখ্যান, (ছ) প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (জ)*ক্রীড়া (পুরাতন শিক্ষাক্রম) শুধু বিকেএসপির শিক্ষার্থীদের জন্য
মানবিক	**যেকোনো তিনটি বিষয় :** ৪. ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. পৌরনীতি ও সুশাসন ৬. অর্থনীতি ৭. সমাজবিজ্ঞান অথবা সমাজকর্ম ৮. ভূগোল ৯. যুক্তিবিদ্যা	১০. (ক) পৌরনীতি ও সুশাসন, (খ) অর্থনীতি, (গ) ভূগোল, (ঘ) যুক্তিবিদ্যা, (ঙ) সমাজবিজ্ঞান, (চ) সমাজকর্ম, (ছ) ইতিহাস, (জ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (ঝ) ইসলাম শিক্ষা, (ঞ) মনোবিজ্ঞান, (ট) পরিসংখ্যান, (ঠ) নৃ-বিজ্ঞান (নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সাপেক্ষে) (ড) কৃষিশিক্ষা (ঢ) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (ণ) চারু ও কারুকলা (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (ত) নাট্যকলা (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (থ) সমরবিদ্যা (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (দ) আরবি অথবা পালি অথবা সংস্কৃত (পুরাতন শিক্ষাক্রম), **(ধ) লঘু সংগীত** (পুরাতন শিক্ষাক্রম), **(ন)** উচ্চতর গণিত, (প) *ক্রীড়া (পুরাতন শিক্ষাক্রম) শুধু বিকেএসপির শিক্ষার্থীদের জন্য
ব্যবসায় শিক্ষা	৪. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫. হিসাববিজ্ঞান ৬. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা অথবা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	৭. (ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, (খ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, (গ), পরিসংখ্যান, (ঘ) ভূগোল, (ঙ) অর্থনীতি, (চ) কৃষিশিক্ষা, (ছ) গার্হস্থ্যঅর্থনীতি (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (জ) সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা (২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত চলবে)
ইসলাম শিক্ষা	৪. ইসলাম শিক্ষা ৫. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৬. আরবি (পুরাতন শিক্ষাক্রম)	৭. (ক) সমাজবিজ্ঞান, (খ) সমাজকর্ম, (গ) কৃষিশিক্ষা, (ঘ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (ঙ) মনোবিজ্ঞান, (চ) যুক্তিবিদ্যা, (ছ) ভূগোল, (জ) অর্থনীতি
গার্হস্থ্য অর্থনীতি	৪. সাধারণ বিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ৫. ব্যবহারিক শিল্পকলা এবং বস্ত্র ও পোষাক শিল্প ৬. গৃহ ব্যবস্থাপনা ও শিশুবর্ধণ এবং পারিবারিক সম্পর্ক (পুরাতন শিক্ষাক্রম)	৭. (ক) পৌরনীতি ও সুশাসন, (খ) মনোবিজ্ঞান, (গ) অর্থনীতি, (ঘ) সমাজকর্ম, (ঙ) ভূগোল, (চ) সমাজবিজ্ঞান, (ছ)সংগীত লঘু/উচ্চাঙ্গ(পুরাতন শিক্ষাত্রম), (জ) সাচিবিকবিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা এবং (ঞ) ইসলাম শিক্ষা
সংগীত	৪. লঘু সংগীত (পুরাতন শিক্ষাক্রম) ৫. উচ্চাঙ্গ সংগীত (পুরাতন শিক্ষাক্রম) ৬. অর্থনীতি অথবা পৌরনীতি ও সুশাসন অথবা ইতিহাস	৭. (ক) অর্থনীতি, (খ) পৌরনীতি ও সুশাসন, (গ) মনোবিজ্ঞান, (ঘ) যুক্তিবিদ্যা, (ঙ) গার্হস্থ্যঅর্থনীতি (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (চ) সমাজবিজ্ঞান, (ছ) সমাজকর্ম

* **ইতিহাস** এবং **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি** বিষয় দুটির মধ্যে যেকোনো একটি আবশ্যিক অথবা ঐচ্ছিক হিসাবে নেওয়া যাবে। তেমনিভাবে **সমাজবিজ্ঞান** ও **সমাজকর্ম** বিষয় দুটির যেকোনো একটি আবশ্যিক অথবা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নেওয়া যাবে। উল্লেখ থাকে যে, বিষয় দুটি একই সঙ্গে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক হিসাবে নেওয়া যাবে না।

* ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে পারবে।

- সকল বিষয়ে দুই পত্র থাকবে এবং পূর্ণ নম্বর হবে ২০০।
- শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে একটি পত্র থাকবে এবং এর পূর্ণ নম্বর হবে ১০০।
- সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক পিরিয়ড ৫টি।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের সাপ্তাহিক পিরিয়ড ৩টি।
- প্রতিটি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি হবে ৬০ মিনিট।
- একই বিষয় শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে দু'বার নেওয়া যাবে না।
- যে সব বিষয়ে ব্যবহারিক আছে ঐসব বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক সমন্বিতভাবে চলবে। অর্থাৎ তত্ত্বীয় অংশ এবং এ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক অংশের শিখন-শেখানো কার্যক্রম একই সাথে পরিচালিত হবে। পাঠ্যপুস্তক সেভাবেই প্রণীত হবে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি বই ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তবে রেফারেন্স হিসাবে অন্যান্য বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬.৫ 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' অনুসারে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় কাঠামো (২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর হবে)

১. শিক্ষার্থীকে নিম্নের যেকোন একটি শাখায় ভর্তি হতে হবে। শাখাসমূহ হচ্ছে–

ক. মানবিক খ. বিজ্ঞান গ. ব্যবসায় শিক্ষা ঘ. ইসলাম শিক্ষা শাখা ঙ. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান এবং চ. সংগীত

২. সকল শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

৩. **শাখাভিত্তিক বিষয়সমূহ-**

শাখা	**শাখাভিত্তিক আবশ্যিক তিনটি বিষয়**	**শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)**
বিজ্ঞান	৪. পদার্থবিজ্ঞান ৫. রসায়ন ৬. জীববিজ্ঞান অথবা উচ্চতর গণিত	৭. (ক) জীববিজ্ঞান, (খ) উচ্চতর গণিত, (গ) কৃষিশিক্ষা, (ঘ) ভূগোল, (ঙ) মনোবিজ্ঞান, (চ) পরিসংখ্যান, (ছ) মৃত্তিকাবিজ্ঞান, (জ) প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (ঝ)*ক্রীড়া (পুরাতন শিক্ষাক্রম),
মানবিক	৪. ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. পৌরনীতি ও সুশাসন অথবা অর্থনীতি অথবা যুক্তিবিদ্যা ৬. সমাজবিজ্ঞান অথবা সমাজকর্ম অথবা ভূগোল	৭. (ক) পৌরনীতি ও সুশাসন, (খ) অর্থনীতি, (গ) ভূগোল, (ঘ) যুক্তিবিদ্যা, (ঙ) সমাজবিজ্ঞান, (চ) সমাজকর্ম, (ছ) ইসলাম শিক্ষা, (জ) মনোবিজ্ঞান, (ঝ) পরিসংখ্যান, (ঞ) নৃ-বিজ্ঞান (নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সাপেক্ষে) (ট) কৃষিশিক্ষা (ঠ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, (ড) চারু ও কারুকলা, (ঢ) নাট্যকলা (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (ণ) সমরবিদ্যা (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (ত) আরবি অথবা পালি অথবা সংস্কৃত (পুরাতন শিক্ষাক্রম), (থ) *ক্রীড়া (পুরাতন শিক্ষাক্রম)
ব্যবসায় শিক্ষা	৪. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫. হিসাববিজ্ঞান ৬. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, অথবা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	৭. (ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, (খ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, (গ) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, (ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়ন (নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সাপেক্ষে), (ঙ) পরিসংখ্যান, (চ) ভূগোল, (ছ) অর্থনীতি, (জ) কৃষিশিক্ষা, (ঝ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, (ঞ) সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা (২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত)
ইসলাম শিক্ষা	৪. ইসলাম শিক্ষা ৫. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৬. আরবি	৭. (ক) সমাজবিজ্ঞান, (খ) সমাজকর্ম, (গ) কৃষিশিক্ষা, (ঘ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, (ঙ) মনোবিজ্ঞান, (চ) যুক্তিবিদ্যা, (ছ) ভূগোল, (জ) অর্থনীতি
গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	৪. শিশুর বিকাশ ৫. খাদ্য ও পুষ্টি ৬. গৃহ ব্যবস্থাপনা এবং পারিবারিক জীবন	৭. (ক) শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ, (খ) মনোবিজ্ঞান, (গ) অর্থনীতি, (ঘ) সমাজকর্ম, (ঙ) ভূগোল, (চ) সমাজবিজ্ঞান
সঙ্গীত	৪. লঘু সঙ্গীত ৫. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ৬. অর্থনীতি অথবা পৌরনীতি ও সুশাসন অথবা ইতিহাস	৭. (ক) অর্থনীতি, (খ) পৌরনীতি ও সুশাসন, (গ) মনোবিজ্ঞান, (ঘ) যুক্তিবিদ্যা, (ঙ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, (চ) সমাজবিজ্ঞান, (ছ) সমাজকর্ম

* ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে পারবে।

- **ইতিহাস** এবং **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি** বিষয় দুটির মধ্যে যেকোনো একটি আবশ্যিক অথবা ঐচ্ছিক হিসাবে নেওয়া যাবে। তেমনিভাবে **সমাজবিজ্ঞান** ও **সমাজকর্ম** বিষয় দুটির যেকোনো একটি আবশ্যিক অথবা ঐচ্ছিক হিসাবে নেওয়া যাবে। উল্লেখ থাকে যে, বিষয় দুটি একই সঙ্গে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক হিসাবে নেওয়া যাবে না।
- সকল বিষয়ে দুই পত্র থাকবে এবং পূর্ণ নম্বর হবে ২০০।
- শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে একটি পত্র থাকবে এবং এর পূর্ণ নম্বর হবে ১০০।
- সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক পিরিয়ড ৫টি।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের সাপ্তাহিক পিরিয়ড ৩টি।
- প্রতিটি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি হবে ৬০ মিনিট।
- একই বিষয় শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে দু'বার নেওয়া যাবে না।
- যে সব বিষয়ে ব্যবহারিক আছে ঐসব বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক সমন্বিতভাবে চলবে। অর্থাৎ তত্ত্বীয় অংশ এবং এ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক অংশের শিখন-শেখানো কার্যক্রম একই সাথে পরিচালিত হবে। পাঠ্যপুস্তক সেভাবেই প্রণীত হবে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি বই ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। তবে রেফারেন্স হিসাবে অন্যান্য বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষাক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ অর্থাৎ শিখনফল অর্জন প্রধানত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে শ্রেণিশিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা ও যথোপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের সঠিক ব্যবহার। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অনেক কঠিন ও জটিল কাজ যা করার জন্য অনেক শ্রম ও সময় প্রয়োজন তা যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সহজে ও কম সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে কম পরিশ্রমে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে পারেন।

৭.১ শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

৭.১.১ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয়তার দু'টি ক্ষেত্র-মানসিক সক্রিয়তা ও দৈহিক সক্রিয়তা। মানসিক সক্রিয়তা অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত করা। এমন সমস্যা, প্রশ্ন বা কাজ দেওয়া যার সমাধান চিন্তা করে বের করতে হয়। দৈহিক সক্রিয়তা হলো হাতে-কলমে কাজ করে শেখা। শিক্ষা লাভ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা গেলে কম সময়ে ও সহজে শিখন সম্ভব।

৭.১.২ মানুষ এক ধরনের কাজে দীর্ঘ সময়ে মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপ্তি বয়স্কদের চেয়ে কম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপ্তি ৮ থেকে ১০ মিনিট, তাও আবার নির্ভর করে কাজটি কতটা আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক তার উপর। অতএব শ্রেণি কার্যক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলোচনা, দলগত কাজ, গল্প, লেখা, আঁকা, বিতর্ক, অভিনয়, হাতে-কলমে কাজ, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব।

৭.১.৩ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র (every individual is a unique)। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা বেশি বিবেচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষালাভ সহজ হয়।

৭.১.৪ শিক্ষাকে বলা হয় 'ব্লক প্রক্রিয়া'। ব্লকের উপর ব্লক স্থাপন করে বিরাট ইমারত তৈরি করা হয়। একইভাবে জানা অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনে সহজে সহায়তা দেওয়া যায়। তাই শিক্ষার্থীর জীবন থেকে উপমা, উদাহরণ দিয়ে এবং পূর্বলব্ধ জ্ঞান, দক্ষতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হলে শিক্ষা লাভ সহজ হয়।

৭.১.৫ শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা বুঝে শিখবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। না বুঝে মুখস্থ করা যথার্থ শিক্ষা নয়। এতে শিখনের সঞ্চালন হয় না। বুঝে শিখলে বা কোনো সমস্যা সমাধানের যুক্তি ও পদ্ধতি বুঝে প্রয়োগ করলে অনুরূপ সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থী নিজেই করতে পারে। তাই শিখনের জন্য মুখস্থের চেয়ে বুঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৭.১.৬ শিক্ষা লাভে যথাযথ শিক্ষা উপকরণের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব বিষয়েই কম-বেশি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ আছে। শিক্ষোপকরণের সাহায্যে জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে সহজ ও মূর্ত করে উপস্থাপন করে বিষয়টিকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। একটি ছোট গাছ শ্রেণিতে প্রদর্শন করে গাছের বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা করলে কিংবা মাল্টিমিডিয়ায় সূর্যগ্রহণ দেখালে তা সম্বন্ধে যত সহজে সঠিক ধারণা লাভ সম্ভব অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের অভিনয় বা চার্ট ব্যবহার করা যায়।

৭.১.৭ শিখনকে স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের ব্যবস্থা। নতুনভাবে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা বারবার অনুশীলন করা হলে একদিকে যেমন শিখন স্থায়ী হয়, অন্যদিকে শিখন সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭.১.৮ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এমন হবে যেন শিক্ষার্থী শুধু লেখাপড়া বিষয়ক সমস্যা নয়, তার যে কোনো ব্যক্তিগত, পারিবারিক সমস্যা বিনা সংকোচে শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে। শিক্ষক সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিবেন এবং সাধ্যমত সহায়তা করবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে কোনো দেয়াল থাকবে না। সম্পর্ক হবে স্নেহ-শ্রদ্ধার এবং খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক।

৭.১.৯ শিক্ষকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তাঁর সকল শিক্ষার্থীই শেখার সামর্থ্য সম্পন্ন। সবার শেখার উপায় ও গতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে সবাই শিখবে। কোন শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাব থাকলে ঐ শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উচ্চ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন শিক্ষার্থীকে কখনও 'তার মাথায় গোবর', 'তোকে দিয়ে কিছুই হবে না', 'গাধা', 'অপদার্থ' ইত্যাদি কোনো ধরনের নেতিবাচক বা নিরুৎসাহমূলক কথা বলা যাবে না। বেত ব্যবহার বা কোনো প্রকার শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান শিক্ষা লাভের অন্তরায় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভয়-ভীতি না দেখিয়ে বরং উৎসাহ প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে যায়।

৮. শিখন মতবাদ

৮.১ শিক্ষা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখন মতবাদ। দীর্ঘদিন ধরে থর্নডাইকের 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' মতবাদ (Trail and Error Theory of Thorndike); পেভলভের উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াভিত্তিক সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (Conditioned Reflex Theory of Pavlov); কোহেলার ও কাফকারের সমগ্রতাবাদ (Gestalt Theory) শিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে আসছে। বয়সভেদে শিশুদের অবধারণ ক্ষমতা ভিন্ন এ বিষয়ে Theory of Cognitive Development of Piaget শিক্ষাবিজ্ঞানে সবিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এ মতবাদে অবধারণ ক্ষমতা বা সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে ১ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিশু জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হচ্ছে (ক) ০-২ বছর সংবেদন সঞ্চালনের স্তর (খ) ২-৭ বছর প্রাক-কার্যকর স্তর (গ) ৭-১১ বছর বাস্তব কার্যকর স্তর এবং (ঘ) ১১-১৬ বছর আনুষ্ঠানিক কার্যকর স্তর। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিশুর অবধারণ ক্ষমতা বা সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন বয়সের শিশু কতটুকু ধারণ করতে পারে বা কোন বয়সে কী কী ধরনের বিমূর্ত ধারণা লাভ করতে সক্ষম সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। শিখনের উল্লিখিত প্রত্যেকটি মতবাদ মূলত আচরণবাদ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচ্য শিখন মতবাদটি ধারণা গঠন সম্পর্কিত যা গঠনবাদ নামে পরিচিত।

৮.২ গঠনবাদ (Constructivist Theory)

শিক্ষার্থী কিভাবে শেখে এ সম্পর্কে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত সর্বাধুনিক তত্ত্ব হচ্ছে গঠনবাদ। ল্যাটিন শব্দ Constrvere থেকে Construct শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ বিন্যাস করা বা গঠন দেওয়া। তাই এ তত্ত্বের মূলকথা হলো ধারণা গঠনই শিখন। প্রতি মুহূর্তে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তথ্য দ্বারা আমাদের চিন্তনের মধ্যে যে নিয়মিত গঠন এবং পরিবর্তন হচ্ছে তার মাধ্যমেই শিখন প্রক্রিয়া ঘটে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিকতা অনুধ্যান করে নিজের মতো এককভাবে নতুন জ্ঞান ও ধারণা গঠন করে। ব্যক্তি নতুন কিছুর সম্মুখীন হলে সে এটাকে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করে। এভাবেই ব্যক্তি নতুন ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করে। যাচাইয়ে নতুন বিষয়কে অবান্তর মনে হলে এটাকে সে বাতিল করে দেয়। শিখনের ক্ষেত্রে Jerome Bruner পরিবেশ ও ভাষা বিকাশের উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, জ্ঞানবিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা বেশি এবং জ্ঞানবিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশু জ্ঞানের আওতাভুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিভিন্নভাবে দেয়। এটা নির্ভর করে শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর।

David Jonassen মনে করেন গঠনবাদে শিক্ষকের ভূমিকা হবে নতুন ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। শুধু তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করা নয়। শিক্ষক সমস্যা-সমাধান বা অনুসন্ধানের নির্দেশনা দিবেন, শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই অনুমিত ধারণা তৈরি ও পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দলগত শিখন পরিবেশে অন্যদেরকে তা জানাতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা উদঘাটন করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। Jonassen আরও মনে করেন যে, শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করে এবং তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি কৌশলের যথার্থতা যাচাই করে নিজেরাই ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়, কিভাবে শিখতে হয় (How to learn) তা তারা আয়ত্ত করে ফেলে। এভাবে তারা জীবনব্যাপী শিক্ষার্থীতে (Life-long learners) পরিণত হয়।

গঠনবাদভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের বিন্যাস হবে শঙ্খিল (spiral)। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী অর্জিত ধারণা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন ধারণা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে।

David Jonassen এর মতানুসারে গঠনবাদী শ্রেণিকক্ষে শিখন হবে-

- **গঠিত (Constructed) :** শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বজ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতার সাথে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে অনুধ্যানের মাধ্যমে নিজের মাঝে নতুন ধারণা গঠন করবে।
- **সক্রিয় (Active) :** শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা সৃষ্টি করবে। শিক্ষক তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা করতে, উপকরণাদি ব্যবহার করতে, প্রশ্ন করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে সুযোগ করে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা দিবেন।

৮. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কতিপয় পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষার্থীর শিখন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত পদ্ধতি ও কৌশলের উপর। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও প্রবণতা এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক হলে এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে। এখানে কয়েকটি পদ্ধতি ও কৌশলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

৮.১ প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method)

প্রশ্ন-উত্তর একটি বহুল প্রচলিত ও কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রেখে শিখনে সহযোগিতা করা যায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। শেখার জন্য প্রশ্ন, শিখনফল অর্জন পরিমাপের জন্য প্রশ্ন, কোন বিশেষ কর্মের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন, ইত্যাদি বেশ কয়েক ধরনের প্রশ্ন রয়েছে।

৮.২ প্রশ্ন করার রীতি

- সমস্ত শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করা। একজন কোনো শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হলে শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকে, অমনোযোগী হতে পারে। তাই সবাইকে সক্রিয় রাখার জন্য সমস্ত শ্রেণিকে প্রশ্ন করতে হয়।
- চিন্তা করে উত্তর ঠিক করার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া।
- উত্তর দানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। উত্তরদানে সক্ষম শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে। সবার একসাথে উত্তর দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট করে উত্তর দিতে বলা। একই শিক্ষার্থীকে বার বার উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে পর্যায়ক্রমে সবাইকে সুযোগ দেওয়া। প্রয়োজনে উত্তরদানে ইঙ্গিত দিয়ে সহায়তা করা। উত্তর সঠিক না হলে অন্য শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলা।
- সঠিক উত্তর পুনরাবৃত্তি করা।
- এরপর পূর্বে হাত উঠায় নি এমন অপারগ শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা।
- প্রয়োজনে অনুসন্ধানী প্রশ্ন (probing question) করা। একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে যে প্রশ্ন জাগে তাকে অনুসন্ধানী প্রশ্ন বলা হয়।

৮.২.১ প্রশ্নের ধরন

- প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ ও শ্রেণি উপযোগী।
- প্রশ্ন হবে শিক্ষার্থীর চিন্তা উদ্দীপক ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী। ‘কেন’, ‘কিভাবে’, ‘কারণ কী’, ‘ব্যাখ্যা কর’, ‘বিশ্লেষণ কর’, ‘তুলনা কর’ ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করা হলে চিন্তা করে উত্তর বের করতে হয়।
- যেসব প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ এমন প্রশ্ন না করাই ভাল। স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন যেমন ‘কী’, ‘কে’, ‘কোথায়’, ‘কয়টি’ বা ‘কাকে বলে’ ইত্যাদি প্রশ্ন যতটা সম্ভব পরিহার করা।
- পর্যায়ক্রমে এমনভাবে প্রশ্ন করা যেন প্রশ্নসমূহের উত্তর থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝে আলোচনা করা।
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (probing question) অর্থাৎ একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন করে বিষয়ের পূর্ণতা আনা প্রয়োজন। যেমন-

  মূল প্রশ্ন : বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কত?

  উত্তর : সাধারণ সময়ে ৮৫%, বিশেষ সময়ে ৫০%

  অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন : বিশেষ সময়ে কম কেন?

  উত্তর : ধান রোপণ ও ধান কাটার মৌসুমে ছেলেমেয়েদের অনেকে কৃষিকাজে অভিভাবককে সহায়তা করে তাই তারা বিদ্যালয়ে আসে না।

৮.২.২ শিক্ষকের করণীয়

- সঠিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদান
- ভুল উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া ও শিখতে অনুপ্রেরণা প্রদান করা
- সঠিক উত্তরের প্রসঙ্গ টেনে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা
- শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে সুযোগ দেওয়া, উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

৯. দলগত সহযোগিতামূলক শিক্ষা পদ্ধতি

দলগত সহযোগিতামূলক পদ্ধতি একটি সফল শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান-দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

৯.১ দল গঠন

বিভিন্নভাবে দল গঠন করা যায়। যেমন সম-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, মিশ্র সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, বিষয়ভিত্তিক দল, অঞ্চলভিত্তিক দল ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র সামর্থ্যে দলের সুবিধা অন্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি। প্রতি পাঠের জন্য বা প্রতি বিষয়ের জন্য নতুন করে দল গঠন করতে গেলে অনেক সময় লাগে। তাই শ্রেণিশিক্ষক (যিনি প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস নেন) দল গঠন করবেন। প্রয়োজনে এক মাস অন্তর অন্তর নতুন করে দল গঠন করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ার পরিসর বৃদ্ধি পায়। একই শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক গঠিত দলগুলোকেই দলগত কাজে নিয়োজিত করবেন। প্রতিটি দলের আকার ৬জন থেকে ৮জন হলে ভাল, তবে ১০জনের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক দলের একটি করে নাম থাকলে সুবিধা হয়। ফল, ফুল, পাখি, নদী বা রং এর নামে দলের নাম রাখা যায়।

৯.১.১ দলগত কাজের আসন বিন্যাস

দলগত কাজের আসন বিন্যাস এমন হবে যাতে দলের সকল শিক্ষার্থী মুখোমুখি বসতে পারে। শ্রেণিকক্ষের আকার বড় হলে এবং পর্যাপ্ত আসবাবপত্র থাকলে, প্রতি দল গোল টেবিলের চারপার্শ্বে বসবে। এরূপ আসবাবপত্র না থাকলে পাকা মেঝেতে মাদুরেও গোল হয়ে বসতে পারে। নতুবা প্রথম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা ঘুরে দ্বিতীয় বেঞ্চের মুখোমুখি বসবে, এভাবে তৃতীয় বেঞ্চ ঘুরে চতুর্থ বেঞ্চের মুখোমুখি। এক্ষেত্রে প্রতি দলের শিক্ষার্থীদেরকে পর পর দু'বেঞ্চে বসতে হবে। শিক্ষক দলগত কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই দলবদ্ধভাবে বসে দলগত কাজ শুরু করতে হবে। আসবাবপত্র টানাটানি করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

৯.১.২ দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া

- দলে ভাগ হওয়ার আগেই সমবেত ক্লাসে শিক্ষক স্পষ্ট করে দলগত কাজ বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক দলের একজনকে একটি কাজের জন্য দলনেতা মনোনয়ন দিবেন। পর্যায়ক্রমে দলের প্রত্যেককে দলনেতার দায়িত্ব দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বসবে। দলের প্রত্যেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে। তারপর আলোচনা শুরু করবে। একজন কথা বলার সময় অন্যরা মন দিয়ে শুনবে। কথার মাঝে কেউ কথা বলবে না। তবে আলোচনা অযথা দীর্ঘ বা প্রসঙ্গ বহির্ভূত হলে দলনেতা ভদ্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।
- দলের প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।
- আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন করবে।
- কারো কথা অপছন্দ হলে বা মনঃপুত না হলে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে, পরে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যাবে, রাগ করা বা অশোভন আচরণ করা যাবে না।
- জোর করে অন্যদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না।
- আলোচনার ফলাফল দলের সিদ্ধান্ত হিসাবে লিখতে হবে এবং সবাইকে মেনে নিতে হবে।
- পরবর্তীতে সমবেত ক্লাসে শিক্ষকের নির্দেশানুসারে ঐ আলোচনার দলনেতা দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। অন্য দলের প্রশ্ন থাকলে দলের পক্ষে যে কোনো একজন উত্তর দিবে।
- দলগত কাজ চলার সময় কোনো মতানৈক্য বা সমস্যা দেখা দিলে দলনেতা হাত তুলে শিক্ষকের নির্দেশনা চাইবে।

৯.১.৩ দলগত কাজের ধরন

দলগত কাজ প্রধানত অনুসন্ধানমূলক বা সমস্যাভিত্তিক হবে। দলগত কাজের বিষয় চিন্তা উদ্দীপক, সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী হবে। সাধারণ তত্ত্ব, তথ্য বা জ্ঞানমূলক জানার বিষয় দলগত আলোচনার বিষয় হয় না। তাতে অনুসন্ধান বা চিন্তা উদ্দীপক কিছু থাকে না।

৯.১.৪ দলগত কাজের কয়েকটি উদাহরণ

ক. বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ক্রমাগত বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ও তাদের রক্ষার উপায় অনুসন্ধান।
খ. গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করণীয় নির্ধারণ।
গ. পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ।
ঘ. বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার রক্ষায় সরকার, সমাজ ও অভিভাবকের করণীয় নির্ধারণ।
ঙ. একটি অনুচ্ছেদের সারমর্ম উদ্‌ঘাটন।

৯.১.৫ দলগত কাজের বিষয় হিসাবে সঠিক নয়

ক. অনুপাতসহ বায়ুর উপাদানসমূহের নাম

খ. বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা

গ. সার্ক দেশসমূহের রাজধানী, জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়

ঘ. পরমাণুর গঠন বর্ণনা

ঙ. তথ্য অধিকার আইন বর্ণনা

৯.১.৬ দলগত কাজের মাধ্যমে শিখন দুর্বলতার অবসান

শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারে না। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন দুর্বলতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ দলগত কাজের ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে একই শ্রেণির একজন শিখনফল অর্জনকারী চৌকস শিক্ষার্থীকে দলনেতা হিসাবে দলের অন্যদেরকে শিখন সহযোগিতা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক দলনেতাকে পূর্বেই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দেন। সমপর্যায়ের শিক্ষার্থী দ্বারা অন্য শিক্ষার্থীদেরকে শিখন সহযোগিতা দেওয়াকে ‘Peer Learning’ বলা হয়।

৯.১.৭ দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষকের করণীয়

দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। যেখানে যখন প্রয়োজন নির্দেশনা ও সহায়তা দিবেন। পরবর্তীতে দলগত কাজ উপস্থাপনের সময় ভুল-ভ্রান্তি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে ধরিয়ে দিবেন।

১০. প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)

প্রদর্শন পদ্ধতির মূলকথা হলো কোনো কিছু দেখিয়ে সে সম্পর্কে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা। কোনো কিছু উপস্থাপনে শুধু বর্ণনা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা দেখানো হলে ধারণা লাভ সহজ হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে পাঠের বিষয় সংশ্লিষ্ট বাস্তব বস্তু বা প্রত্যক্ষভাবে প্রক্রিয়া দেখিয়ে বর্ণনা, আলোচনা বা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা হয়। যেমন- একটি জবা ফুলের অংশগুলো দেখিয়ে ফুলের অংশগুলোর সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়তা করা; শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে যন্ত্রপাতি সংযোজন করে দস্তার সাথে পাতলা সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করে দেখানো ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তু বা ঘটনা সরাসরি দেখানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে অর্ধবাস্তবের সাহায্যে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শ্রেণিকক্ষে সিডি বা ডিভিডির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ায় পৃথিবী ও চাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণন দেখিয়ে গ্রহণ ঘটার বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। প্রজেক্টর বা মাল্টিমিডিয়া না থাকলে চার্টের মাধ্যমে দেখানো যায়। ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে শিক্ষা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো প্রত্যক্ষ দেখানো যায়। সম্ভব হলে ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে ও বর্ণনা করে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- কুমিল্লার কোটবাড়ি শালবন বিহারে পরিদর্শনে নিয়ে তৎকালীন বৌদ্ধসভ্যতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা।

প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। সহজে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। শিখন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রদর্শন পদ্ধতিতে লক্ষ রাখতে হবে যেন সব শিক্ষার্থী স্পষ্ট দেখতে পায়।

১১. অনুসন্ধানমূলক কাজের ধরন

অনুসন্ধানমূলক কাজ মূলত কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি। ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা দলগতভাবে নিজেদের প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় বা ঘটনা বা সমস্যার কারণ, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি উদ্‌ঘাটন করে। নথিপত্র পর্যালোচনা, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ নানাভাবে অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা যায়।। উদাহরণ-

- যুবসমাজের আকাশ সংস্কৃতির প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল
- শিল্প অঞ্চলে বায়ু দূষণের কারণ ও ফলাফল
- খাদ্য উৎপাদনে অতিমাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া।

১২. অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়া

প্রত্যেকটি অনুসন্ধানের জন্য একটি বিষয় বা সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে যাবতীয় কার্যক্রম প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। পর্যায়গুলো হচ্ছে-

ক. সমস্যা/উদ্দেশ্য নির্ধারণ

খ. পরিকল্পনা প্রণয়ন

গ. তথ্য সংগ্রহ

ঘ. তথ্য বিশ্লেষণ

ঙ. প্রতিবেদন প্রণয়ন

সর্ব প্রথমে কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিত করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে, কোনটি কিভাবে, কী দিয়ে, কখন করতে হবে-এ সবই পরিকল্পনায় থাকে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রণয়ন করতে হবে। সর্বশেষ শিক্ষাথী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানমূলক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

১৩. শিখন- শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনেক ধরনের। এর কয়েকটি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষালাভে সহায়ক। সব পদ্ধতিরই কমবেশি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এমন কোনো পদ্ধতি বা কৌশল নেই যেটি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে উপযোগী বা সব ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী। শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা এবং শ্রেণি ও পাঠ উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্য। এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে একটি পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে। পাঠকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক পরিস্থিতি অনুসারে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশলের সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের বিচক্ষণতা, বিষয়জ্ঞান ও শিখন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। এজন্য বলা হয় শিক্ষকই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বহুবিধ। এখানে মাত্র কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। তবে শিক্ষকের অধিক সংখ্যক পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তিনি যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি উপযোগী তা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠ পরিচালনার সময় শিক্ষক যদি বুঝতে পারেন যে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিখনে ফলপ্রসূ হচ্ছে না তখন তিনি পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন। তাই শিক্ষকদের বহু পদ্ধতির উপর দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

১৪. শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হলো শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত পূর্ব নির্ধারিত শিখনফল শিক্ষার্থী কতটা অর্জন করেছে তা নিরূপণই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। যদিও মূল্যায়ন কথাটির বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করে থাকি। মূল্যায়নের সময় ও ধরন বিবেচনায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রধানত দুই ধারার: (ক) গঠনকালীন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং (খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন। আমরা পাঠ চলাকালীন বা নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীর অর্জন মূল্যায়ন করে থাকি। এ মূল্যায়ন ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন। আবার আমরা নির্দিষ্ট সময় শেষে বা কার্যক্রম শেষে সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকি। এ ধরনের মূল্যায়ন হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় ধারার মূল্যায়নেরই প্রয়োজন আছে। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ-

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কিছু দক্ষতা, যেমন- শোনা, বলা, পড়া ইত্যাদি কম সময়ে, কম খরচে ও সহজে পরিমাপ করে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর ব্যবহৃত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও কার্যকারিতা নির্ধারণ করে বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।

১৫. ধারাবাহিক মূল্যায়ন

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে নির্দেশনা দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১৫.১ শ্রেণির কাজ

শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত। বিষয়ভেদে শ্রেণির কাজের ধরনে তারতম্য থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র), আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, চরিত্র-অভিনয়, ব্যবহারিক কাজ-এ ধরনের সব কিছুই শ্রেণির কাজ। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৫.২ বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ । বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে এটাই প্রত্যাশিত। শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে, শিক্ষার্থী একাই কাজটি সম্পন্ন করেছে। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় শিখন সহায়তা দিবেন। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বাড়ির কাজ দিবেন।

- লক্ষ রাখতে হবে বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করায় উৎসাহিত না করে। বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যেন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে।
- শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ যেন বাড়ির কাজে থাকে। বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্সে শিখন শেখানো কার্যক্রম কলামে প্রদত্ত বাড়ির কাজ নমুনা হিসাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।
- প্রতিটি বিষয়ের বাড়ির কাজগুলো এমন হবে যা শিক্ষার্থী ৩০-৩৫ মিনিটের মধ্যে সম্পাদন করতে পারে। শিক্ষক প্রতি সাময়িকে শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাড়ির কাজ দিবেন।

১৫.৩ শ্রেণি অভীক্ষা

প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। শেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে। প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা স্বল্প সময় নেওয়া হবে। বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে নেওয়া হবে। নির্ধারিত এক ক্লাস পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না। শ্রেণি অভীক্ষার দিন শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম যথারীতি চলবে।

১৬ সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রতি শিক্ষাবর্ষে দু'টি সাময়িকে ভাগ করা হবে। সাময়িক এবং পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা অনুসারে হবে। শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত অধ্যায়সমূহকে দু'টি সাময়িকের জন্য বণ্টন করতে হবে। বিদ্যালয়ের কার্যদিবসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অধ্যায়সমূহকে সাময়িকে বণ্টন করতে হবে। প্রথম সাময়িকে মূল্যায়নকৃত অধ্যায়সমূহকে দ্বিতীয় সাময়িকে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। সাময়িক শেষে **অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা শিক্ষাক্রমে বিষয় এবং পত্রের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বরে হবে। শিক্ষাক্রম রূপরেখার বিষয়কাঠামোয় বিষয়ের পূর্ণনম্বর দেওয়া আছে।**

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রশ্নপত্রে দুই ধরনের প্রশ্ন থাকবে। একটি হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অপরটি হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার চার স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিকহারে থাকবে। সকল অধ্যায়কে পরীক্ষার আওতাভুক্ত করতে হবে। প্রশ্নপ্রত্র প্রণয়নের পূর্বে নির্দেশক ছক তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকবে এবং উদ্দীপকের সাথে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন ৪টি দিয়ে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর **(জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা)** যাচাই করা হবে। তবে হিসাববিজ্ঞান গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ের হিসাব সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে শুধু চিন্তন দক্ষতার প্রয়োগ স্তারের ৩টি প্রশ্ন থাকবে। ১টি সহজ মানের, ১টি মধ্যমানের ও একটি অপেক্ষা কঠিন মানের প্রশ্ন নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সভাপতি
২.	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৩.	ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।	সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ধানমন্ডি, ঢাকা।	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।	সদস্য
৮.	পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৯.	প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১৩.	সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১৪.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।	সদস্য
১৫.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৬.	অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৭.	অধ্যাপক শাহীন মাহ্‌বুবা কবীর ইংরেজি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
১৮.	সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১৯.	সদস্য (পাঠ্যপুস্তক), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
২০.	প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	সদস্য
২১.	উপ সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য

২. প্রফেশনাল কমিটি

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ধানমন্ডি, ঢাকা।	সদস্য
৪.	পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল প্রধান সম্পাদক, বৈশাখী টেলিভিশিন লিমিটেড, ঢাকা।	সদস্য
৮.	প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	সদস্য
৯.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা ও সভাপতি, বাংলাদেশ আন্তঃ বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি।	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১২.	অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ পরিচালক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।	সদস্য

১৩.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান পরামর্শক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
১৪.	অধ্যাপক কফিল উদ্দীন আহমেদ পরামর্শক, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
১৫.	প্রফেসর মুহাম্মদ আলী প্রাক্তন সদস্য, শিক্ষাক্রম, এনসিটিবি, ঢাকা। (বাসা-'সপ্তক'-মেভিস ৮ম তলা (পশ্চিম), ৬/৯, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।	সদস্য
১৬.	ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৭.	প্রফেসর সালমা আখতার আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৮.	অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
১৯.	সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
২০.	প্রধান শিক্ষক, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা।	সদস্য
২১.	জনাব মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া বিতরণ নিয়ন্ত্রক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৩. টেকনিক্যাল কমিটি

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	প্রফেসর মোঃ আবদুল জব্বার প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম, ঢাকা। (বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-১১, সেক্টর নং-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০)	আহবায়ক
২.	অধ্যাপক ড. আবু হামিদ লতিফ সুপার নিউমারি অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩.	প্রফেসর আবদুস সুবহান প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সি-৮, বাসা নং-৫২, রোড নং-৬/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।)	সদস্য
৪.	অধ্যাপক ড. গোলাম রসুল মিয়া প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা। (বাসা নং-৪৭, রোড নং-০২, সেক্টর-০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।)	সদস্য
৫.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান পরামর্শক এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	সদস্য
৬.	প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল করিম চৌধুরী ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৭.	ড. আব্দুল মালেক অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৯.	জনাব শাহীনারা বেগম বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ মোখলেস উর রহমান বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ ফরহাদুল ইসলাম ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৪. ভেটিং কমিটি

ক্রমিক	নাম ও পদবি		কমিটিতে পদবি
১.	**বাংলা**	১.	অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পরিচালক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।
		২.	প্রফেসর নূরজাহান বেগম অধ্যক্ষ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা।
২.	**ইংরেজি**	১.	প্রফেসর আবদুস সুবহান প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। (সি-৮, বাসা নং-৫২, রোড নং-৬/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা)
		২.	প্রফেসর মোঃ শামসুল হক প্রাক্তন ডীন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (বাসা নং-২৫, এ্যাপার্টমেন্ট-বি-৫, রোড নং ৬৮এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২)
৩.	**গণিত**	১.	প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মতিন গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
		২.	প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪.	**বিজ্ঞান**	১.	প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুর রহমান পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
		২.	জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী সহযোগী অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৫.	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**	১.	প্রফেসর ড. হারুন উর রশিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
		২.	ড. সৈয়দ হাফিজুর রহমান সহযোগী অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
৬.	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি**	১.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
		২.	জনাব মোঃ সফিউল আলম খান সহকারী অধ্যাপক, তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭.	**পরিবেশ পরিচিতি**	১.	প্রফেসর ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
		২.	প্রফেসর ড. মোঃ খবীরউদ্দীন পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৫. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১	প্রফেসর শামীমা পারভীন অধ্যক্ষ ,সরকারি সঙ্গীত কলেজ, আগারগাঁও ঢাকা।	**আহবায়ক**
২	জনাব মাহমুদুল হাসান সহযোগী অধ্যাপক, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, সরকারি সঙ্গীত কলেজ, আগারগাঁও ঢাকা।	সদস্য
৩	ড. মহসীনা আক্তার খানম প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব শামীমা আখতার কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ,এসইএসডিপি,এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব সুরজিৎ রায় মজুমদার কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

৬. সার্বিক সমন্বয় কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও এসইএসডিপি ফোকাল পয়েন্ট কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ইউনিট জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সার্বিক সমন্বয়কারী
২.	জনাব মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া বিতরণ নিয়ন্ত্রক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সার্বিক সমন্বয়কারী

শিক্ষাক্রম

লঘুসঙ্গীত

১. ভূমিকা

শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষা যদি হয় প্রদীপ শিখা সংস্কৃতি তার আলোকছটা। যুগ যুগ ধরে বিশ্বের সকল উন্নত দেশ ও জাতিই তাদের আপন সংস্কৃতিকে লালন করে তাদের পরিচয়ের একটি ধারক ও বাহক হিসেবে সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে আসছে।

বিশ্বের প্রতিটি প্রেক্ষাপটই পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানুষ হয়ে উঠে সুরুচিবান, সংস্কৃতিবান এবং গড়ে তোলে একটি ঐতিহ্যসচেতন সুশৃংখল জাতি। সৃজনশীল শিক্ষার অন্তর্গত এই শিক্ষা মনুষকে আত্মশুদ্ধি দান করে, মেধা-মননকে একাগ্র করে আধ্যাত্মিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলে ধৈর্যশীল, শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কার মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। প্রকৃত অর্থে একজন মানুষের ভেতর অনেকগুলো ঘুমন্ত সত্তা থাকে যা হয়তো সে নিজেও অনুধাবন করতে পারে না। সংস্কৃতিচর্চা সেই সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তুলে তাকে লোভ-লালসা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত করে। একজন সঙ্গীত সাধক একাধারে যেমন ভাল মানুষ তেমনি একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব।

সঙ্গীতচর্চা বা সাধনা তাকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলে এতে করে ঘোচে বেকারত্ব, হয় আত্মকর্মসংস্থান। শুধু তাই নয় উন্নত দেশগুলোতে সঙ্গীতকে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কণ্ঠসঙ্গীতের দুটি ধারা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও লঘুসঙ্গীত। লঘুসঙ্গীত বলতে বাণী ও সুর-তালের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ মনোরজ্ঞ রচনা যা চিত্তকে বিকশিত করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, আধুনিক গান এ সবই লঘুসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্য যুগে (১১০০-১৮০০ খ্রি:) সঙ্গীতের কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্থান ছিল না। শুধুই বিনোদনের বিষয় ছিল। রাজা বাদশাহ, জমীদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত পরিচালিত হতো। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সঙ্গীত তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্থান করে নিয়েছে। তাই বিশ্বের এবং এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সঙ্গীতও স্থান করে নিয়েছে। সঙ্গীতচর্চাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে একটি আধুনিক মানের সঙ্গীত শিক্ষাক্রম একান্ত প্রয়োজন এবং বাংলাদেশের সকল স্কুল, কলেজগুলোতে সত্তর কার্যক্রম চালু করা একান্ত প্রয়োজন। এই শিক্ষা কার্যক্রমে এবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংযুক্ত হওয়ায় এর মান উচ্চতর হয়েছে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আমাদের সংস্কৃতিকে বর্হিবিশ্বে পৌছে দিতে পারবে।

সঙ্গীতশিক্ষা অন্যান্য বিষয় থেকে বেশ আলাদা। এই শিক্ষার জন্যে সাধারণ মেধার সঙ্গে সঙ্গে জন্মগত কিছু প্রতিভা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেমন গানের জন্যে সুন্দর কণ্ঠ, নাচের জন্যে নৃত্যবোধ।

সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা। শুধু বই পড়ে বা স্বরলিপি দেখে কখনো সঙ্গীতকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়া যায় না। তাই সঙ্গীতকে প্রাতিষ্ঠানিক করলেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২০১২ এর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রমে সঙ্গীতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে একটি উন্নত বিশ্বমানের সঙ্গীত কার্যক্রম তৈরির সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীতের একটি সম্যক ধারণা নিয়ে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে যেন আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে সেদিকে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীতশিল্পী না হলেও তারা চাইলে যেন হতে পারে একজন সঙ্গীত সমালোচক, সঙ্গীত সাংবাদিক, গীতিকার, সুরকার অথবা সঙ্গীত পরিচালক।

মাতৃভাষায় রচিত লঘুঙ্গীতের সঠিক চর্চা বাংলার সঙ্গীত জগতকে করবে ঐশ্বর্যময়।

২. উদ্দেশ্য

১.বাংলাগানের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

২.লঘুসঙ্গীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং সঙ্গীতচর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৩. লঘুসঙ্গীতের তাত্ত্বিক বিষয়াদি জানা এবং এর প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া।

৪. কণ্ঠসঙ্গীত চর্চার পদ্ধতি জানা এবং উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৫. বিভিন্ন ধারার বাংলাগান সম্পর্কে দক্ষতা লাভ করা এবং শুদ্ধভাবে পরিবেশন করতে পারা।

৬. আঞ্চলিক গানের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৭. লঘুসঙ্গীত শিল্পীদের জীবনী এবং সঙ্গীতে তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানা।

৮. যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৯. দেশীয় লোকবাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১০. আকারমাত্রিক স্বরলিপি লিখন ও পঠন পদ্ধতি জানা ও প্রয়োগ করা।

১১. বাংলাগানে ব্যবহৃত তাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১২. দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৩. বিভিন্ন সঙ্গীত গ্রন্থাদি পাঠে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৪. লঘুসঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১৫. সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে মন ও মননকে বিকশিত করে চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করা এবং মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা।

প্রথম পত্র

৩. অধ্যায় বিন্যাস ও বণ্টন

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম		
দ্বিতীয়		
তৃতীয়		
চতুর্থ		
পঞ্চম		
ষষ্ঠ		
সপ্তম		
অষ্টম		

দ্বিতীয় পত্র

৪ . অধ্যায় বিন্যাস ও বণ্টন

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম		
দ্বিতীয়		
তৃতীয়		
চতুর্থ		
পঞ্চম		
ষষ্ঠ		
সপ্তম		
অষ্টম		
নবম		

৫. শিক্ষাক্রম ছক

প্রথম পত্র

তত্ত্বীয়

(ক গুচ্ছ: কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ, খ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: সেতার-বেহালা এবং গ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: তবলার জন্য)

প্রথম অধ্যায়: বাংলাগানের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বাংলাগানের উৎপত্তি বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাগানের ক্রমবিকাশ (চর্যাপদ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত) বর্ণনা করতে পারবে।	• বাংলাগানের উৎপত্তি • বাংলাগানের ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাগানের ধারা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার বাংলাগানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন ধারার বাংলাগানের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে।	• রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত এবং অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন
৩. রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুলসঙ্গীতের ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুলসঙ্গীত

তৃতীয় অধ্যায়: প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ (০৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী বর্ণনা ও সঙ্গীতে তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।	• লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, হাছন রাজা, রামপ্রসাদ সেন

চতুর্থ অধ্যায়: প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী (০৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পীদের জীবনী বর্ণনা ও সঙ্গীতে তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।	• আঙ্গুরবালা, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, আব্বাস উদ্দিন আহমদ, আবদুল আলিম

পঞ্চম অধ্যায়: তাল ও স্বরলিপি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তালের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।	• লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল (রবীন্দ্র ও নজরুল সৃষ্ট তালসহ) • আকারমাত্রিক স্বরলিপি লিখন পদ্ধতি।

(যে কোনো একটি গুচ্ছ নির্বাচন করতে হবে। ক গুচ্ছ: কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ, খ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: সেতার-বেহালা এবং গ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: তবলা)

ব্যবহারিক: কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ

প্রথম অধ্যায়: বাংলাগান পরিবেশনা (৮০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাগান পরিবেশন করতে পারবে। (প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ৪টি করে।)	• পল্লীগীতি–ভাওয়াইয়া,ভাটিয়ালী, জারি, সারি, বাউল • রবীন্দ্রসঙ্গীত– পূজা, স্বদেশ, প্রেম এবং বিচিত্রা • নজরুলসঙ্গীত–কাব্যসঙ্গীত, দেশাত্ববোধক, রাগাশ্রয়ী, কীর্তন এবং লোকসুরের গান। • অতুলপ্রসাদের গান, কান্তগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বরলিপি পঠন, তবলা বাদন এবং সুর বাঁধা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল মুখে ব'লে এবং হাতে তালি দিয়ে দেখাতে এবং ঠেকা বাজাতে পারবে। ২. সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে সুর বাঁধতে পারবে। ৩. স্বরলিপি দেখে সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারবে।	• লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল • যন্ত্রে সুর বাঁধা • স্বরলিপি পদ্ধতির প্রয়োগ

ব্যবহারিক: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ(সেতার এবং বেহালা)

প্রথম অধ্যায়: লঘুসঙ্গীত পরিবেশনা (৮০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাগান পরিবেশন করতে পারবে। (প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ৪টি করে।)	• পল্লীগীতি–ভাওয়াইয়া,ভাটিয়ালী, জারি, সারি, বাউল • রবীন্দ্রসঙ্গীত– পূজা, স্বদেশ, প্রেম এবং বিচিত্রা • নজরুলসঙ্গীত–কাব্যসঙ্গীত, দেশাত্ববোধক, রাগাশ্রয়ী, কীর্তন এবং লোকসুরের গান। • অতুলপ্রসাদের গান, কান্তগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বরলিপি পঠন, তবলা বাদন এবং সুর বাঁধা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
৪. লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল মুখে ব'লে এবং হাতে তালি দিয়ে দেখাতে এবং ঠেকা বাজাতে পারবে। ৫. সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে সুর বাঁধতে পারবে। ৬. স্বরলিপি দেখে সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারবে।	• লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল • যন্ত্রে সুর বাঁধা • স্বরলিপি পদ্ধতির প্রয়োগ

ব্যবহারিক: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ (তবলা)

প্রথম অধ্যায়: লঘুসঙ্গীতে সঙ্গত (৯০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাগানের সাথে সঙ্গত করতে পারবে।	• পল্লীগীতি–ভাওয়াইয়া,ভাটিয়ালী, জারি, সারি, বাউল • রবীন্দ্রসঙ্গীত– পূজা, স্বদেশ, প্রেম এবং বিচিত্রা • নজরুলসঙ্গীত–কাব্যসঙ্গীত, দেশাত্ববোধক, রাগাশ্রয়ী, কীর্তন এবং লোকসুরের গান। • অতুলপ্রসাদের গান, কান্তগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি
২.সঠিক পদ্ধতিতে তবলায় সুর বাঁধতে পারবে।	• যন্ত্রে সুর বাঁধা

৬. শিক্ষাক্রম ছক

দ্বিতীয় পত্র

তত্ত্বীয়

(ক গুচ্ছ: কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ, খ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: সেতার-বেহালা এবং গ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: তবলার জন্য)

প্রথম অধ্যায়: বাংলাগানের ধারা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন ধারার লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে। ৩. দেশাত্ববোধক গানের বর্ণনা করতে পারবে।	• লোকসঙ্গীত • দেশাত্ববোধক গান : ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গান ইত্যাদি

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ধারণা লাভ করতে পারবে।	• বাঁশী, খোল, দোতারা, একতারা, সারিন্দা, ঢোল, খোল, প্রেমজুড়ি, হারমোনিয়াম, করতাল এবং খমক।

তৃতীয় অধ্যায়: প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী বর্ণনা ও সঙ্গীতে তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।	• দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, রাধারমন, শাহ আব্দুল করিম

চতুর্থ অধ্যায়: প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. সঙ্গীত শিল্পীদের জীবনী বর্ণনা ও সঙ্গীতে তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।	• ইন্দুবালা, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, সুচিত্রা মিত্র, কাসেম মল্লিক, মোমতাজ আলী খান এবং আবদুল লতিফ ।

পঞ্চম অধ্যায়: বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধার ধারণা লাভ করতে পারবে।	• তানপুরা, তবলা, সেতার, দোতারা, বেহালা, সরোদ, এস্রাজ এবং সারিন্দা।

(যে কোনো একটি গুচ্ছ নির্বাচন করতে হবে। ক গুচ্ছ: কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ, খ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: সেতার-বেহালা এবং গ গুচ্ছ: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ: তবলা)

ব্যবহারিক: কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগ

প্রথম অধ্যায়: বাংলাগান পরিবেশনা (৮০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাগান পরিবেশন করতে পারবে। (প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ৪টি করে।)	• পল্লীগীতি– হাছন রাজা, লালন শাহ্, জসীম উদ্দীন, রাধারমন এবং শাহ আব্দুল করিম • নজরুলসঙ্গীত– ধ্রুপদাঙ্গ, গজল, ইসলামী গান এবং শ্যামা সঙ্গীত • রবীন্দ্রসঙ্গীত– প্রকৃতি, অনুষ্ঠান, ধ্রুপদাঙ্গ এবং ভানুসিংহের পদাবলী • দেশাত্ববোধক গান: ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গান ইত্যাদি

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বরলিপি পঠন, তবলা বাদন এবং যন্ত্রে সুর বাঁধা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল মুখে ব'লে এবং হাতে তালি দিয়ে দেখাতে এবং ঠেকা বাজাতে পারবে। ২.	• লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল
৩. সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে সুর বাঁধতে পারবে।	• যন্ত্রে সুর বাঁধা
৪. স্বরলিপি দেখে সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারবে।	• স্বরলিপি পদ্ধতির প্রয়োগ

ব্যবহারিক: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ (সেতার এবং বেহালা)

প্রথম অধ্যায়: লঘুসঙ্গীত পরিবেশনা (৮০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাগান পরিবেশন করতে পারবে। (প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ৪টি করে।)	• পল্লীগীতি– হাছন রাজা, লালন শাহ্, জসীম উদ্দীন, রাধারমন এবং শাহ আব্দুল করিম • নজরুলসঙ্গীত– ধ্রুপদাঙ্গ, গজল, ইসলামী গান এবং শ্যামা সঙ্গীত • রবীন্দ্রসঙ্গীত– প্রকৃতি, অনুষ্ঠান, ধ্রুপদাঙ্গ এবং ভানুসিংহের পদাবলী • দেশাত্মবোধক গান: ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গান ইত্যাদি

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বরলিপি পঠন, তবলা বাদন এবং যন্ত্রে সুর বাঁধা (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
৫. লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল মুখে ব'লে এবং হাতে তালি দিয়ে দেখাতে এবং ঠেকা বাজাতে পারবে। ৬.	• লঘুসঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল
৭. সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে সুর বাঁধতে পারবে।	• যন্ত্রে সুর বাঁধা
৮. স্বরলিপি দেখে সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারবে।	• স্বরলিপি পদ্ধতির প্রয়োগ

ব্যবহারিক: যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগ (তবলা)

প্রথম অধ্যায়: লঘুসঙ্গীতে সঙ্গত (৯০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বিভিন্ন ধারার এবং পর্যায়ের লঘুসঙ্গীতে সঙ্গত করতে পারবে।	• পল্লীগীতি– হাছন রাজা, লালন শাহ্, জসীম উদ্দীন, রাধারমন এবং শাহ আব্দুল করিম • নজরুলসঙ্গীত– ধ্রুপদাঙ্গ, গজল, ইসলামী গান এবং শ্যামা সঙ্গীত • রবীন্দ্রসঙ্গীত– প্রকৃতি, অনুষ্ঠান, ধ্রুপদাঙ্গ এবং ভানুসিংহের পদাবলী • দেশাত্মবোধক গান: ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গান ইত্যাদি
২. সঠিক পদ্ধতিতে তবলায় সুর বাঁধতে পারবে।	• যন্ত্রে সুর বাঁধা

লেখক নির্দেশনা

লঘুসঙ্গীত

তত্ত্বীয়

- পর্যায় ভিত্তিক গান নির্বাচন করে তার স্বরলিপি প্রদান করতে হবে।
- যন্ত্রসঙ্গীতের অধ্যায়ে বিভিন্ন যন্ত্রের ছবিসহ যন্ত্রের অংশ চিহ্নিত করতে হবে।
- সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী লেখার সময় তাদের ছবি দিতে হবে এবং জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে লিখতে হবে।
- মাত্রা ও তাল চিহ্নসহ প্রতিটি প্রচলিত তালের বোল অবশ্যই থকতে হবে।
- সংজ্ঞা ও টিকার বিষয়ে উল্লেখ না থাকলেও বিষয়ের চাহিদা মোতাবেক বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ লেখার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা ও টিকা উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে ।

ব্যবহারিক

- প্রতিটি গানের সঠিক স্বরলিপি অনুযায়ী সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।
- অসীম ধৈর্য সহকারে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করতে হবে।
- গানের বাণী, উচ্চারণ ও প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টিপাত করতে হবে।
- তালাভ্যাস করানো (প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে তবলা বাজিয়ে চর্চা করানো)।
- স্বর সাধনা ও উপস্থাপনার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।
- ক্লাসের নির্ধারিত সময়কে নিয়মিত সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

লঘুসঙ্গীত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

১. লঘুসঙ্গীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চেয়ে গণমুখী চরিত্র বেশি ধারন করে। এর ব্যাপকতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সর্বব্যাপী। লঘুসঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষাক্রম ২০১২ এ লঘুসঙ্গীতের বহুল প্রচলিত সকল শাখাকে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর আওতা বাড়ানো হয়েছে।

২. লঘুসঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক। লঘুসঙ্গীত যেমন বাণীপ্রধান তেমন সঙ্গতপ্রধানও বটে। বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র নানাবিধ ব্যবহারে লঘুসঙ্গীতকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ রেখে বর্তমান শিক্ষাক্রমে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র শাখা রাখা হয়েছে। যেমন- সেতার, বেহালা, তবলা প্রভৃতি। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে যন্ত্রসঙ্গীত অংশের বিস্তৃতি যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে বর্তমান শিক্ষাক্রমে। তবে তা কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের উপর বাড়তি চাপ হবে না।

৩. বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের জীবন ও কর্ম সঙ্গীত বিষয়ের শিক্ষাক্রমের এক অপরিহার্য অধ্যায়। লঘুসঙ্গীতের বর্তমান শিক্ষাক্রমও তার ব্যতিক্রম নয়। যুগের চাহিদা, পরিবর্তিত প্রেক্ষিত ও বাস্তবতার আলোকে সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী সংযোজনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের পাশাপাশি জাতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের বিশেষ প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের অনুকরণীয় আদর্শ খুঁজে পেতে পারে। দ্বিতীয়ত, জীবনীর সাথে সঙ্গীতকারদের ছবি/প্রতিছবি সংযোজনের সুযোগ রাখা হয়েছে যা বর্তমান শিক্ষাক্রমের এক নবতর সংযোজন।

৪. সঙ্গীত একটি ব্যবহারিক প্রধান বিষয়। শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা না করে শিক্ষার্থীরা যেন ব্যবহারিক জীবনে জাতীয় সংস্কৃতির অংগ হিসেবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে লঘুসঙ্গীত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সঙ্গীতের মৌলিক বিষয়গুলো প্রথম থেকেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সংযোজন করা হয়েছে যেন যে কোনো বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীরা এসে সঙ্গীত বিভাগে অধ্যয়ন করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তারা যেন কোন বিশেষ অসুবিধাবোধ না করে। বর্তমান শিক্ষাক্রমের এই বৈশিষ্ট্য সঙ্গীত শিক্ষাকে উন্মুক্ত রেখে সঙ্গীত চর্চাকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা যায়।

৫. লঘুসঙ্গীতের পাঠক্রম প্রণয়নের সময় এই বিষয়টি স্মরণ রাখা হয়েছে যে সঙ্গীত শুধুমাত্র একটি পাঠ্য বিষয় এবং বিনোদনের বিষয় নয়। ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা যাতে সঙ্গীত চর্চাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে সে জন্যে সঙ্গীত চর্চার সাথে তাত্ত্বিক দিকটিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলতঃ শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত শিল্পী না হয়েও সমালোচক, গীতিকার, সুরকার ইত্যাদি হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে। আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টিকে বর্তমান শিক্ষাক্রমে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

লেখকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

বিষয়বস্তু উপস্থাপন (Content Presentation)

১. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তু সহজ, বোধগম্য ও চলিত ভাষায় শ্রেণি উপযোগী করে লিখতে হবে। প্রতিটি অধ্যায় ও বিষয়বস্তুর সাথে পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারিত রয়েছে। সে অনুযায়ী দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করতে হবে যাতে পিরিয়ড মোতাবেক তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

২. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ভাষা প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য হতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণি-উপযোগিকরণের বিচারবোধে সচেতন হতে হবে।

৩. পাঠ্যপুস্তক অধ্যায়ভিত্তিক উপস্থাপন করতে হবে। (প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষার্থীর কর্মপত্র তৈরি করতে হবে। কর্মপত্র হতে হবে শিখনফল পরিপূরণ করে এমন কাজ যা শ্রেণিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।)

৪. প্রতিটি অধ্যায় লেখার সময় শিখন ক্ষেত্রের (বুদ্ধিবৃত্তিয়- জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, ও উচ্চতর দক্ষতা; আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র) প্রতিফলন বিষয়বস্তুরমধ্যে রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে লেখকগণকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

৫. লেখার ধরন এমন হতে হবে যাতে বিষয়বস্তু অনুধাবনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণা অর্জনের মাধ্যমে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৬. জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে কারও অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা যাবে না।

৭. দক্ষতাভিত্তিক শিখনফল অনুযায়ী বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ সম্ভব হয়। নোট কিংবা গাইড বইয়ের স্টাইলে পয়েন্ট ভিত্তিক (কারণ, প্রভাব, প্রতিকার ,ভূমিকা,প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি)বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যাবে না।

৮. প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলনীতে কমপক্ষে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন এবং জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর পূরণ করে এমন তিন ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সংযোজন করতে হবে।

৯. জেণ্ডার সমতা রক্ষা করে পাঠ্যবস্তু (Text Material) রচিত হবে।

১০. নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে হাল নাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পাঠে সংযোজিত হবে।

১১. তত্ত্ব, বিধি, সূত্র, নিয়ম-পদ্ধতি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের ঘটনা উল্লেখ করে কিংবা জীবন ঘনিষ্ঠ উদাহরণের সাহায্যে লিখতে হবে।

বানান ও ভাষারীতি (Spelling & Language Rule)

১২. বাংলা একাডেমীর বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে।

১৩. ভাষা হতে হবে সহজ, প্রাঞ্জল ও শ্রেণি উপযোগী।

অধ্যায় নির্দেশনা (Chapter Instruction)

১৪. অধ্যায়সমূহের ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম রয়েছে। লেখকগণ অধ্যায় শিরোনাম উল্লেখ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং অধ্যায় শিরোনাম, ধারণাসমূহের ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হবে।

১৫. সূচিপত্রে অধ্যায়ের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয় (যা শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত) পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করবেন।

পাঠ্যপুস্তক উপস্থাপন (Text Book Presentation)

১৬. পাঠ্যপুস্তকের কভার পৃষ্ঠা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভাবধারার আঙ্গিকে আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ ব্যবহার করতে হবে।

১৭. অধ্যায় নম্বর ১৪, অধ্যায় শিরোনাম ২৪, হেড শিরোনাম ১৬, সাবহেড শিরোনাম ১৪, বিষয়বস্তু ফন্ট সাইজ ১৩ বিন্যাসে অক্ষর সাইজ এবং লাইন স্পেস ১.২ অনুসরণ করে প্রতিটি অধ্যায় উপস্থাপন করতে হবে।

১৮. অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ছবি/চিত্র/সারণি/মানচিত্র ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক, আকর্ষণীয় ও স্পষ্ট হতে হবে।

১৯. প্রত্যেক বিষয়ের ১০০ নম্বরের পত্রের জন্য পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩০-২৪০ (কম-বেশি) এর মধ্যে হতে হবে।